পহেলা বৈশাখ ১৪৩৩

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১লা বৈশাখ ১৪৩৩
১৪ই এপ্রিল ২০২৬

বাণী

শুভ নববর্ষ ১৪৩৩।

পহেলা বৈশাখের এই শুভক্ষণে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাই। এই উৎসবমুখর দিনে প্রিয় দেশবাসীসহ বিশ্বের সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে জানাই নববর্ষের উষ্ণ শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বাংলা নববর্ষ আমাদের প্রাণের সর্বজনীন উৎসব। এটি আমাদের ঐক্য, সম্প্রীতি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভেদাভেদ অতিক্রম করে পহেলা বৈশাখ আমাদের সবার জন্য হয়ে ওঠে এক আনন্দ ও মিলনের দিন। আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং আত্মপরিচয়ের ধারক ও বাহক হিসেবে এ উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। বৈশাখের আগমনে আমাদের জীবনে জাগে নতুন প্রত্যাশা, নব প্রতিশ্রুতি ও অসীম সম্ভাবনার স্বপ্ন। অতীতের গ্লানি, বেদনা ও ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চলি নব উদ্যমে ও নব প্রত্যয়ে।

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের নতুন পথচলা শুরু হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেশকিছু জনকল্যাণমুখী ও দূরদর্শী কর্মসূচি চালু করেছে। কৃষিনির্ভর এ দেশের প্রেক্ষাপটে মুঘল আমলে ফসলি সনের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে যে বাংলা সনের যাত্রা শুরু, সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় পহেলা বৈশাখে 'কৃষক কার্ড' কর্মসূচির সূচনা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ উদ্যোগ কৃষি খাতের উন্নয়ন এবং কৃষকের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় আজ আমরা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের আরও সংযমী, ধৈর্যশীল ও দায়িত্বশীল হতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হবো–এই প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

নববর্ষের এই উৎসব ও আনন্দমুখর মুহূর্তে আন্তরিক প্রত্যাশা–সকল অশুভ ও অসুন্দর দূরীভূত হোক; সত্য ও সুন্দরের গৌরবগাথা প্রতিধ্বনিত হোক সর্বত্র। বিদায়ি বছরের সকল দুঃখ-বেদনা মুছে যাক; নতুন বছর ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি।

এই আনন্দঘন দিনে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই–আসুন, আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করি; ভেদাভেদ ভুলে গড়ে তুলি একটি অসাম্প্রদায়িক, ঐক্যবদ্ধ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ।

আবারও সবাইকে জানাই 'শুভ নববর্ষ'!

মোঃ সাহাবুদ্দিন

পহেলা বৈশাখের ইতিবৃত্ত ও ভাবনা

অধ্যাপক মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। দিনটি বাংলাদেশে উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়। দিনটি বাংলাদেশে জাতীয় ছুটির দিন। ইংরেজি দিনপঞ্জিতে দিবসটি ১৪ই এপ্রিল। এই দিনে বাংলাদেশিরা জীর্ণ পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনের আবাহন জানায়। প্রাকৃতিকভাবে বৈশাখ মাসটি গ্রীষ্ম ঋতুতে। বৈশাখ মাসটি বাংলাদেশে কালবৈশাখীর জন্য পরিচিত। মনে করা হয়, কালবৈশাখী ঝড় জীর্ণ পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে ঠাঁই করে নিবে।

মোগল শাসন আমলে হিজরি দিনপঞ্জি অনুযায়ী কৃষি খাজনা আদায় করা হতো। কিন্তু হিজরি সন গণনা করা হয় চাঁদ দেখে। এর ফলে কৃষি বর্ষ চন্দ্র বর্ষের সঙ্গে খাপ খায় না। মৌসুমে অসময়ে খাজনা দিতে গিয়ে কৃষকের খুব কষ্ট হতো। কৃষকদেরকে এই কষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্য মোগল বাদশা আকবর দিনপঞ্জিতে সংস্কার নিয়ে আসেন। সম্রাট আকবরের ইচ্ছা অনুযায়ী ফতেহ উল্লাহ সিরাজী নামের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত বাংলা সন নির্ধারণ করেন চান্দ্র হিজরির সঙ্গে বাংলার সূর্যের দিনপঞ্জির সঙ্গে সমন্বিত করে। এভাবে নতুন ফসলি সনের প্রবর্তন হলো ১৫৮৪ সালের ১০/১১ই মার্চ। দিনটি ছিল সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের দিন। ১৫৫৬ সনে সম্রাট আকবর এই দিনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এভাবে যে নববর্ষ চালু হলো তা বঙ্গাব্দ অথবা বাংলা বর্ষ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠল। সহজ ভাষায় আমরা একে বলি বাংলা সন।

আকবরের শাসন আমল থেকে পহেলা বৈশাখ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ঐতিহ্যগতভাবে চৈত্রের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা পরিশোধ করা হতো। পরের দিন অর্থাৎ নববর্ষের দিন জমিদাররা প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতো। এই দিন উপলক্ষ্যে মেলা এবং অন্যান্য উৎসবের আয়োজন করা হতো। যা আজও বাংলাদেশে আয়োজন করা হয়। সময়ের বিবর্তনে দিনটি আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে পরিণত হয়। এই দিনে আনন্দ-উৎসব করাই রীতি।

এই দিনের অন্যতম প্রধান ঘটনা হলো হালখাতা খোলা অর্থাৎ হিসেবে নতুন বই খোলা। এটা সম্পূর্ণরূপে একটি আর্থিক ব্যাপার। গ্রামে, শহরে এবং নগরে বণিক ও ব্যবসায়ীরা তাদের পুরানো হিসাবের খাতা বন্ধ করে নতুন বছরের জন্য নতুন খাতা খোলেন। তারা তাদের ক্রেতাদের দাওয়াত দিয়ে মিষ্টিমুখ করায় এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও পাকাপোক্ত করে তোলে। আমার ছোটোবেলায় দেখেছি একটি থানা শহরে কীভাবে হালখাতা খোলা হতো। ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করাতো। ছোটোবেলায় এই দৃশ্য আমাকে পুলকিত করতো। আমি আমার বাবার সঙ্গে হাত ধরে এই অনুষ্ঠানে যেতাম। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশে হালখাতা খোলার অনুষ্ঠানটি ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে আসছে। এখন রাজধানী নগরীতে ব্যবসায়ীরা হালখাতা খোলে কি না, তা আর টের পাওয়া যায় না। কারণ এখন ব্যবসায়িক লেনদেন নগদ হয়ে গেছে। ক্রেতার সংখ্যা এত বেশি যে কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীর পক্ষে খাতায় পাওনার হিসাব লিখে তাল রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে সময়ের অভিঘাতে নববর্ষে হালখাতা অনুষ্ঠানটি প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে। কিন্তু স্বর্ণালংকারের ব্যবসায়ীরা এখনও হালখাতা খোলে। নববর্ষের দিন ঘনিয়ে আসলে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা তাদের ক্রেতার কাছে কার্ড পাঠিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানায় এবং হালখাতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা কী করে হালখাতার ধারাটি ধরে রেখেছে তা বোঝা খুব কঠিন নয়। কারণ, স্বর্ণালংকারের ক্রেতার সংখ্যা অন্যান্য সামগ্রীর ক্রেতার তুলনায় অনেক কম থাকে। তাই ক্রেতাদের সঙ্গে এই ব্যবসায়ীরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। ফলে বর্তমানে হালখাতা অনুষ্ঠানটি স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে নববর্ষের দিনটি অনেক গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। ভোর হলে সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিধান করে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এই দিনে বিশেষ খাবারও তৈরি করা হয়। পহেলা বৈশাখে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এখনও মেলার আয়োজন করা হয়। সমাজতাত্ত্বিকভাবে মেলা শুরু হয়েছিল বাজার অর্থনীতি বিকাশের প্রথম পর্বে। বৈশাখী মেলার সুযোগে গ্রামীণ হস্তশিল্পবিশারদ ও অন্যান্য কারুশিল্পীরা তাদের তৈরি পণ্য বিক্রয়ের একটা সুযোগ গ্রহণ করে বৈশাখী মেলার মাধ্যমে। বৈশাখী মেলায় কৃষিপণ্য, ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, খেলনা, প্রসাধনী ও নানা রকমের খাবার ও মিষ্টান্ন বিক্রয় করা হয়। এসব মেলায় মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য সংগীত, নৃত্য, যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা গান, গাজির গান এবং আলকাপ গানের আয়োজন করা হয়। গ্রামবাংলার এই গানগুলো মূলত বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক। এ ছাড়াও মেলায় পরিবেশিত হয় বাউল, মারফতি, মুরশিদি এবং ভাটিয়ালি গান। কাহিনি-নাটক হিসেবে লাইলী-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা এবং রাধাকৃষ্ণের নাটকও মঞ্চস্থ করা হয়। এসব মঞ্চস্থ করতে গিয়ে উন্নতমানের পোশাক-আশাকের ব্যবহার হয়তো হয় না। সবকিছুই নির্ভর করে আর্থিক সামর্থ্যের ওপর। এছাড়া পুতুলনাচ মেলার একটি বড়ো আকর্ষণ। মেলায় বাঁশি, ডুগডুগি ও একতারাসহ নানা ধরনের গ্রামীণ বাদ্যযন্ত্র বিক্রয় হয়। একটি বাংলা গানের অতিপরিচিত একটি ছত্র হলো, 'আমি মেলা থেকে তাল পাতার এক বাঁশি কিনে এনেছি।'

ছোটোবেলায় ডাকাতিয়া নদীর তীরে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে বৈশাখী মেলা বসতে দেখেছি। সেই মেলায় বিশাল লোকসমাগম হতো। মেলায় গিয়ে বায়োস্কোপ দেখারও সুযোগ হয়েছিল আমার। এই বায়োস্কোপ সিনেমার পর্দার বায়োস্কোপ নয়। চার পায়ার উপর বসানো একটি বাক্সের মধ্যে নানা ছবি সাজানো থাকতো। এই ছবিগুলো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটার পর একটা বদলানো হতো। কাচের গোল চাকতিটি দিয়ে ভেতরের ছবি দেখা যেত বহুগুণ বড়ো। এই বায়োস্কোপে তখন আমি রাজধানী ঢাকা শহরের নানা স্থাপনা দেখার সুযোগ পেয়েছি। দেখেছি কী করে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মানুষ যাতায়াত করে। এই বায়োস্কোপের একটি দৃশ্য ছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের বাড়ি। এখন সেই বাড়িটি বাংলা একাডেমির সম্পদ। বায়োস্কোপওয়ালা ছবি পরিবর্তন করতে করতে ছড়া কাটতো, 'আহার দেখো, বাহার দেখো, ঢাকারও শহর দেখো, নূরুল আমীনের বাড়ি দেখো'। সময়টা ছিল বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিক। ঐ সময় বাংলা ভাষার বিরোধিতা করার জন্য নূরুল আমীন খুব নিন্দিত হয়েছিল। সেই ক্রোধ আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল বৈশাখী মেলায় বায়োস্কোপের মধ্য দিয়ে।

পহেলা বৈশাখের উৎসবে আগে যেসব আয়োজন হতো এখন এগুলোর অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ১৯৫০-এ জমিদারি উচ্ছেদ আইন হওয়ার ফলে জমিদারি প্রথাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গেছে পুণ্যাহর অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে জমির খাজনার হিসাবনিকাশ মিলানো হতো। এ ছাড়া ছিল ঘুড়ি উড়ানো উৎসব যা এখনো প্রচলিত আছে। মুন্সিগঞ্জে মহিষের দৌড় একটি অত্যন্ত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়াও ছিল ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, পায়রা উড়ানো ও নৌকাবাইচ। সময়ের প্রবাহে এগুলোর অনেকটাই উঠে গেছে। তার একটা বড়ো কারণ, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষের পক্ষে তিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। যদিও বেকারত্ব বিশাল, তা সত্ত্বেও মনে হয় কারোরই যেন সময় নেই। সময় নেই ষাঁড়ের লড়াই কিংবা পায়রা উড়ানো অনুষ্ঠানের আয়োজন করার। যত সময় গড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে ক্ষণিকের যতিও আর নেই। কারণটি বোধহয়, বিজ্ঞান দিয়েছে গতি, কেড়ে নিয়েছে যতি। চট্টগ্রামে এখনও বলীখেলা হয়। এই খেলায় চট্টগ্রামবাসীর প্রবল উৎসাহ লক্ষ করা যায়। চট্টগ্রাম সওদাগর-প্রধান এলাকা। এরাই বলীখেলার আয়োজনে অর্থ ব্যয় করে থাকেন। চট্টগ্রামবাসীরা প্রবল উৎসাহ, উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা নিয়ে বলীখেলা দেখার জন্য জড়ো হয়।

পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। গত কয়েক দশক ধরে রমনার বটমূলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনে নগরবাসীর এলিট অংশ ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। তবে প্রশ্ন জাগে কেবল রবীন্দ্রসংগীত কেন? বাংলা ভাষায় অমর অবদান রেখেছেন এমন আরও অনেক কবি সংগীত রচনা করেছেন। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে সকল ধারার কবিদের গান গীত হলে অনুষ্ঠানটি আরও সর্বজনীন ও সার্থক হতো। অন্যথায় মনে হয়, সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তা থেকে একপেশে মনোভাব নিয়ে রবীন্দ্রচর্চা করা হচ্ছে। এ কথাগুলো বলে রবীন্দ্রনাথের মহৎ অবদানকে ছোটো করতে চাই না। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি অন্য কবিদের গানও যদি গীত হয় তাতে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা বাড়ে বই কমে না। কারণ, বাংলা সাহিত্যে অনেক কবি ও লেখক একদিকে যেমন রবীন্দ্র

প্রভাবিত অন্যদিকে অনেকেই সচেতনভাবে চেষ্টা করেছে রবীন্দ্রবলয় থেকে মুক্ত হতে। এর সবকিছু নিয়েই আমাদের বাংলা সংস্কৃতি।

পহেলা বৈশাখে নতুন কাপড় পরাও একটি ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বিপুলভাবে পায়জামা-পাঞ্জাবি, শাড়ি ও অলংকারের ব্যবসা গত কয়েক দশক ধরে জমে উঠেছে। এভাবে পহেলা বৈশাখের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবর্তে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সংযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই পহেলা বৈশাখ শুধু আনন্দ উপভোগের উৎসব নয়। এর বিশাল অর্থনৈতিক তাৎপর্যও সৃষ্টি হয়েছে। এখন শহরের নাগরিকদের মধ্যে 'পান্তা ইলিশ' খাওয়ার একটি রীতি গড়ে উঠেছে। একদিকে বাণিজ্যিকভাবে পান্তা ইলিশ খাওয়া হয়, অন্যদিকে রাজধানীর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা পহেলা বৈশাখে নানা ধরনের খাবারের সঙ্গে পান্তা ইলিশও যোগ করে। অনেকে মনে করে, এই আচার-অনুষ্ঠানটি গ্রামবাংলার মেহনতি মানুষের প্রতি একধরনের সূক্ষ্ম ঘৃণার অভিব্যক্তি। গ্রামের মানুষরা বিশেষ করে দিনমজুর ও খেতমজুররা শুধু পহেলা বৈশাখে নয়, প্রায় হররোজই সকালবেলায় পান্তা খেয়ে দিনের কাজ শুরু করে। কিন্তু তাদের পক্ষে পান্তার সঙ্গে দামি ইলিশ যোগ করা সম্ভব হয় না। এই বৈপরীত্বে মনে হয় নাগরিকদের পান্তা ইলিশ খাওয়া দরিদ্রদের প্রতি একধরনের উপহাস বই আর কিছুই নয়। পহেলা বৈশাখের উৎসবের সঙ্গে গত কয়েক বছরে যোগ হয়েছে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। এই শোভাযাত্রায় যেসব ধর্মীয় প্রতীক ও মুখোশ ব্যবহার করা হয় তা পহেলা বৈশাখের সর্বজনীন ইহজাগতিক চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। যারা এই শোভাযাত্রার আয়োজন করেন তাদেরকে ভাবতে হবে কীভাবে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীকে আহত না করে শোভাযাত্রাটিকে প্রকৃত অর্থে একটি সর্বজনীন আয়োজনে পরিণত করা যায়। এ বিতর্ক থেকে মুক্ত হতে এবার উদ্‌যাপিত হচ্ছে 'বৈশাখী শোভাযাত্রা'।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতির মধ্যে নববর্ষ পালনে ঐতিহ্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্যে 'নিউ ইয়ার্স ডে' পালিত হয়। ইরানে 'নওরোজ উৎসব' বহুকাল ধরে জমজমাটভাবে পালিত হয়ে আসছে। গণচীনেও এরকম উৎসব রয়েছে। আমরা বাংলাদেশের জনগণ অতি ভাগ্যবান যে আমাদের রয়েছে পহেলা বৈশাখের মতো একটি উৎসবের দিন–যেটি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও আর্থিক সামর্থ্যের বেড়াজাল অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১লা বৈশাখ ১৪৩৩
১৪ই এপ্রিল ২০২৬

বাণী

বিদায় ১৪৩২। স্বাগত বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩। পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ বিশ্বের সকল বাংলাভাষী মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতিসত্তার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের এক অনন্য প্রতীক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দিনটি আমাদের জীবনে প্রতি বছর ফিরে আসে নতুনের আহ্বান নিয়ে। নতুন বছরের আগমনে পুরোনো জীর্ণতা ও গ্লানি পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়।

পহেলা বৈশাখের সঙ্গে আমাদের এ অঞ্চলের কৃষি, প্রকৃতি এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্পর্ক নিবিড়। তথ্যপ্রযুক্তির এই সুবর্ণ সময়েও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কৃষক তাঁর ফসল উৎপাদনের দিনক্ষণ ঠিক করে। বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য, লোকজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও মূল্যবোধের ধারাবাহিকতা পহেলা বৈশাখের মাধ্যমে নতুন করে উজ্জীবিত হয়। বৈশাখী মেলা, বৈশাখী শোভাযাত্রা, হালখাতার মতো ঐতিহ্যবাহী আয়োজন আমাদের সংস্কৃতির বহুমাত্রিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরে এবং আমাদেরকে ঐক্যবোধে উজ্জীবিত করে। বাংলা নববর্ষ আমাদের সামনে এনেছে নতুন প্রত্যাশা ও নতুন সম্ভাবনা। প্রকৃতির নবজাগরণ আর মানুষের অন্তরের আশাবাদ মিলেমিশে সৃষ্টি করে এক প্রাণবন্ত উৎসবমুখর পরিবেশ।

দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিবাদী শোষণ-শাসনের অবসানের পর গত ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে যাত্রা শুরু করে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার। দায়িত্ব নিয়েই এই সরকার রাষ্ট্র এবং সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবন মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই ফ্যামিলি কার্ড, ক্রীড়া কার্ড, খাল খনন কর্মসূচি চালু, ইমাম, মুয়াজ্জিন, খতিব এবং অন্য ধর্মের ধর্মীয় গুরুদের জন্য আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে। কৃষক, কৃষি এবং কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন থেকে শুরু হলো কৃষক কার্ড প্রদান কর্মসূচি। আগামী দিনগুলোতে এই কৃষক কার্ড বাংলাদেশের কৃষক এবং কৃষি অর্থনীতিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে, বাংলা নববর্ষে এটিই হোক আমাদের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা।

আমি আশা করি, বাংলাদেশের জনগণের যার যার ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সহনশীলতা, উদারতা ও সম্প্রীতির চর্চা গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বহুমতের সহাবস্থানকে সুদৃঢ় করবে। বিশ্ব আজ নানা সংকট ও সংঘাতে বিপর্যস্ত। এই প্রেক্ষাপটে শান্তি, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চর্চা আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। নববর্ষের এই শুভক্ষণে আমরা যেন সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবকল্যাণের পথ অনুসরণ করি–এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। নতুন বছরের প্রথম প্রভাতে আমরা অতীতের সব হতাশা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করি। নববর্ষ সবার জীবনে বয়ে আনুক সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। দেশবাসীকে আবারও জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শুভ নববর্ষ ১৪৩৩।

তারেক রহমান

মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১লা বৈশাখ ১৪৩৩
১৪ই এপ্রিল ২০২৬

বাণী

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে সবাইকে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

এই দিনটি নানা কারণে আমাদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যময়। পহেলা বৈশাখের মর্মবাণী এখন আর দুটো শব্দের ভেতর সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। পহেলা বৈশাখ আমাদের যাপিত জীবনে অনন্য একটি দিন। বৈশাখ আপাতদৃষ্টিতে বাংলা বর্ষের প্রথম মাস হলেও এর সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বিশাল। আমাদের ঐতিহ্য চেতনার সঙ্গেও এর নিবিড় সখ্য লক্ষ করা যায়। আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বর্ষবরণ একটি অন্যতম পার্বণ। একসময় পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল গ্রাম। কালক্রমে এই উৎসব গ্রাম থেকে শহরে বিস্তৃত হয়েছে। বর্ষবরণের দিন হিসেবে পহেলা বৈশাখ সারা দেশে সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে রাজধানী ঢাকা হয়ে উঠেছে এই উৎসবের কেন্দ্রস্থল।

বৈশাখ থেকে চৈত্র, এই বারো মাসে বাঙালির উৎসব-পার্বণের শেষ নেই। পারিবারিক, সামাজিক এবং গ্রামীণ জীবনের নানামাত্রিক অনুষ্ঠানাদি আমাদের জীবনধারায় এনেছে বৈচিত্র্য। এসব লোকাচার বা অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলাগুলো অন্যতম। মেলা মানেই উৎসব-আনন্দ। আর মেলাকেন্দ্রিক উৎসব আয়োজনের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য সময় হচ্ছে বৈশাখের প্রথম সাত দিন। একেবারে নগর জীবন থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক মানুষের জীবনেও বৈশাখী উৎসবের ছোঁয়া লাগে। আর এই সুবাদে কিছুটা হলেও বাংলা মাসগুলো সম্পর্কে আমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা জন্মে। তাই সর্বস্তরে বৈশাখ উদ্‌যাপন অত্যন্ত দরকারি একটি কাজ।

বৈশাখী মেলায় লোকশিল্পের চমৎকার সমাবেশ ঘটে। কিছু কিছু বৈশাখী মেলা ও উৎসব বেশ প্রাচীন এবং সমাদৃত–ঐতিহ্যবাহীও বটে। এসব মেলা ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে আরো অনেক ঐতিহ্যবাহী লোকজ সংস্কৃতি। গ্রামীণ সমাজ থেকে বৈশাখী মেলা শুরু হলেও বর্তমানে বৈশাখী মেলার উপকরণ ও উদ্‌যাপনে ভিন্নতা এসেছে। নাগরিক জীবন পহেলা বৈশাখে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে নতুন মাত্রা যোগ করতে গিয়ে যেন আমাদের ঐতিহ্যের বিকৃত উপস্থাপন না হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখা বাঞ্ছনীয়।

জাতি হিসেবে আমাদের রয়েছে সুদীর্ঘ সময়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সংস্কৃতির এই বহুমাত্রিক ধারাকে সমন্বিতভাবে ধারণ করাই প্রকৃত সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যই আমাদের জাতীয় সম্প্রীতিকে অটুট রাখুক।

সবাই ভালো থাকুন।

নিতাই রায় চৌধুরী এমপি

প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১লা বৈশাখ ১৪৩৩
১৪ই এপ্রিল ২০২৬

বাণী

শুভ নববর্ষ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ উপলক্ষ্যে আমি দেশে এবং বিদেশে বসবাসরত সকল বাংলাদেশি ও বাংলা ভাষাভাষীকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা।

আমাদের রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। নানান ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই ভূখণ্ডে একত্রে বসবাস করায় এখানকার সংস্কৃতি খুবই বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মধ্যে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন একটি সর্বজনীন উৎসব।

নববর্ষ বরাবরই নতুন প্রত্যাশা নিয়ে আবির্ভূত হয়। বিগত বছরের ব্যর্থতা ও গ্লানি ভুলে সকলে প্রত্যাশা করে নতুন বছর সাফল্যে পরিপূর্ণ হবে। সেজন্য প্রত্যেক জাতিই নববর্ষকে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জানায়। বাংলাদেশেও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানানো হয়।

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতীয় চেতনার সামগ্রিক প্রতিচ্ছবির দেখা মেলে। একদিকে যেমন উৎসবে মেতে ওঠে নবীন-প্রবীণ, শিশু-কিশোররা; অন্যদিকে নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের নতুন প্রজন্মও পরিমার্জিত ধারণা লাভ করতে পারে। বাংলা নববর্ষ উৎসবকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে বাংলাদেশি ও বাংলাভাষী মানুষের বসবাস সেসব অঞ্চলে আমাদের সংস্কৃতির নবজাগরণ ঘটে। আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি যেন উৎসবের রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে এই দিনটিতে।

এখানকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে দেশের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করা সম্ভব। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যুক্ত করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পর্যটন শিল্প ও বাণিজ্যের পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়। বর্তমান সরকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনায় রেখেছে।

পুরোনো বছরের গ্লানি মুছে গিয়ে নতুন বছর আমাদের সামনে উন্মোচন করবে সম্ভাবনা ও সাফল্যের নবদিগন্ত–এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ সবার জন্য শুভ ও কল্যাণকর হোক।

খোদা হাফেজ,
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এমপি

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১লা বৈশাখ ১৪৩৩
১৪ই এপ্রিল ২০২৬

বাণী

শুভ নববর্ষ ১৪৩৩।

পহেলা বৈশাখ আমাদের একটি সর্বজনীন লোক-উৎসবের দিন। আনন্দঘন এ দিনে আমি সকল বাংলাদেশিকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা।

পহেলা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত প্রতিটি বাংলাদেশি দিনটিকে উৎসবমুখরভাবে নববর্ষ হিসেবে পালন করেন। এটি আমাদের প্রাণের উৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় বাংলা নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক নববর্ষ। অতীতের গ্লানি, ভুলত্রুটি ভুলে গিয়ে নতুন করে শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্‌যাপিত হয় দিনটি।

আমাদের জীবনে পহেলা বৈশাখ আসে নতুন স্বপ্ন আর অমিত সম্ভাবনা নিয়ে। জীর্ণতা, দীনতা ও নীচতাকে দূরে সরিয়ে সুন্দরের পথে অবিরাম পথ চলার এবং শুদ্ধ সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গীকারের দিন পহেলা বৈশাখ। এই উৎসবের রং অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে। বৈচিত্র্যের সাথে সম্প্রীতির মেলবন্ধনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।

লোকজের সঙ্গে নাগরিক জীবনের সেতুবন্ধন রচনা করেছে এই পহেলা বৈশাখ। ব্যস্ত নগর কিংবা গ্রামীণ জীবন–এই দুইয়ের সঙ্গে আমাদের একাত্ম করে নববর্ষকেন্দ্রিক উৎসবগুলো। এসব উৎসব-পার্বণ আমাদের জাতীয় চেতনাবোধকেও ঐক্যবদ্ধ করে। পহেলা বৈশাখের আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমরা বারবার শিকড়ের কাছে ফিরে যাই। ধর্ম, বর্ণ সহ সকল ধরনের বৈচিত্র্য ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয়তাবাদের মহৎ চেতনায় মিলিত হই।

বৈশাখী মেলা পহেলা বৈশাখের বিশেষ একটি পর্ব। বর্তমানে এই মেলা সমগ্র দেশে লোক-সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। কিছু বৈশাখী মেলা ও উৎসব সুপ্রাচীন সমাদৃত এবং ঐতিহ্যবাহীও বটে। তবে এসব মেলা নিরেট মেলা শুধু নয়। এই মেলা ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে আরো অনেক ঐতিহ্যবাহী লোকজ সংস্কৃতি। যেমন : যাত্রাপালা, কবিগান, লাঠিখেলা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

বর্ষবরণের এসব উৎসব ও বহুমাত্রিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশের সমগ্র জনগণের ঐক্য সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও সমৃদ্ধির আনন্দবার্তা নিয়ে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল।

সবাই ভালো থাকুন।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

কানিজ মওলা